ঠনঠনে স্বাক্ষর

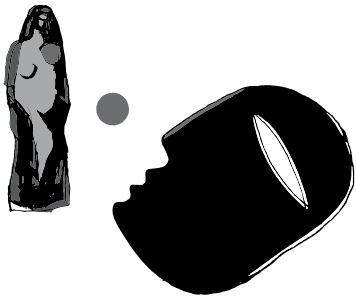

ঠনঠনে স্বাক্ষর

জসিম মল্লিক

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

নির্জন স্বাক্ষর
জসিম মল্লিক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য **২৭৫ টাকা**

Nirjan Shakkhor by Jasim Mallik Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 275 Taka RS: 275 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-29364-6-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

এক সময়ের সাংস্কৃতিক সহযোদ্ধা ও প্রিয় বন্ধু
শামসুদ্দিন কামাল

১

সব ঠিকঠাকই ছিল। হঠাৎ করে সব বদলে গেল। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। দুনিয়াটাই যেন ওলটপালট হয়ে গেল। মোটামুটি ভালোই ছিল মেজবাহউদ্দিন। চাকরিটাও ভালো ছিল। একলার ইনকামে ভালোমতোই চলত। দেশে বড় বোন আর গরিব আত্মীয়স্বজনকে যৎসামান্য সাহায্য করতে পারত। হঠাৎ করে এমন খড়্গ নেমে আসবে তা কে জানত। টাকাপয়সা যা ইনকাম করত খরচ হয়ে যেত বেশিরভাগ। বড় কোনো সেভিংস নেই। করা সম্ভবও না। কাজ করলে টাকা না করলে নাই। তাই কখনো মেজবাহ কাজ কামাই দিত না। অসুখবিসুখও তেমন হতো না। সামান্য ঠাণ্ডা জ্বর পাত্তাই দিত না। পাত্তা দিলে কি আর চলে! ওসব ঠাণ্ডামাণ্ডা গায়ে সয়ে যেত।

ষোলো বছর পর মেজবাহকে ফিরে আসতে হলো দেশে। ফিরে আসতে বাধ্য হলো। এতদিনে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উন্নত দেশে থাকার অভ্যাস। হঠাৎ সেটাতে ছেদ পড়ল। মেজবাহর বড় ভাই সালাহউদ্দিন ওকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতদিনেও গ্রিন-কার্ড হয়নি। ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম কয়েক বছর সালাহউদ্দিন ভাইর কাছে ভার্জিনিয়া থেকেছে মেজবাহ। এ নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াবিবাদ হতো প্রায়ই।

তারপর একদিন চলে এলো নিউইয়র্কে। আসতে বাধ্য হলো। এখানে এসে ভালোই করেছে। অনেক অপরচুনিটি এই শহরে। কে পড়ে থাকে ওসব জায়গায়! আর ভাবির যন্ত্রণা। এখানে সুখেই ছিল। সালাহউদ্দিন ভাই প্রথম প্রথম কিছুদিন মেজবাহকে গোপনে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করত। তখনও ভালো কোনো কাজ জোটাতে পারেনি। টানাটানি থাকত। এরপর একটা কাজ পেয়ে গেল। আস্তে আস্তে মেজবাহ গুছিয়ে নিয়েছিল।

উডসাইডের দিকে একটা এক রুমের বাসা নিয়ে থাকত। বাসাটা ছিমছাম ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেড় হাজার ডলার ভাড়া দিত। এলাকাটা নিরিবিলি। সাত দিনই বলতে গেলে কাজ করত মেজবাহ। কুইন্সের এই এলাকায় প্রচুর বাঙালির বাস। তবে মেজবাহর বেশি বন্ধু ছিল না। অল্প কিছু বন্ধু ছিল। আড্ডা দেওয়ার সময়ই পেত না। কাজ আর বাসা। নিজের রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া এসব তো ছিলই।

মেজবাহর ছিল কবিতা আবৃত্তির অভ্যাস। ভালো গানও গাইতে পারে। মেজবাহর সুবিধা ছিল ছয়টার মধ্যে কাজ শেষ করে বাসায় আসত। মাঝে মাঝে জ্যাকসন হাইটস যেত। বাসা থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথ। দু-একজনের সাথে রেস্টুরেন্টে বসত। মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তির ডাক পড়ত। গানের অনুষ্ঠানেও ডাক আসত। মেজবাহ খুব যে বেশি এসবে জড়িত ছিল তা না। সময় পেলে যেত।

মেজবাহ তেমন আড্ডাবাজ না। একটু শান্ত প্রকৃতির। সবাই বলত ও শুনত। ওর বেশি কথা থাকত না। দেশে তেমন কেউ নেই ওর। ওর ইমিডিয়েট বড় এক ভাই আছে সাউথ আফ্রিকায় থাকে। তার কোনো খবর নেই। বড় বোন দেশে থাকে। প্রায়ই অসুস্থ থাকে। তাকেও কিছু সাহায্য করত মেজবাহ। অনিয়মিত সাহায্য। বড় বোনের কেউ নেই আসলে। একটা মেয়ে আছে শুধু। তার কাছেই থাকে। তার নিজেরই টানাটানি। একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। সামান্য বেতন। তিনটা ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে। স্বামী তেমন কিছু করে না। কিন্তু মাকে তো ফেলে দিতে পারে না। এই বোনের একসময় খুব ভালো অবস্থা ছিল। স্বামী মারা যাওয়ার পর পানিতে পড়ে যায়। জমি জামা যা ছিল তাও নদী ভাঙনে সব বিলীন হয়ে গেছে। বোনের অবস্থা যখন ভালো ছিল তখন মেজবাহর কোনো খরব নেয়নি। কখনো কোনো হেল্পও করেনি।

ছোটবেলা থেকেই বাবা নেই মেজবাহর। সালাহউদ্দিন ভাই সবার বড়। তারপর এই বোন। এই ভাই সংসারটাকে টেনেছে। অল্প বয়সেই আমেরিকা চলে আসে সে। তারপর থেকে সংসার দেখা শুরু করে। তার পাঠানো টাকা দিয়েই ওরা চলত। ওদের দুই ভাইয়ের লেখাপড়া ভাইয়ের পাঠানো টাকা দিয়েই চলত। মেজবাহর বাবা মারা যায় একদম ছোট বয়সে। মা তারপরও অনেকদিন বেঁচে ছিল। কিন্তু একদিন মাও চলে গেল।

মা মারা যাওয়ার সময় ওরা কেউ পাশে ছিল না। না সালাহউদ্দিন ভাই, না মেজো ভাই মজনু, না মেজবাহ। শুধু বোন ছিল। মা অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গেছে। অসুখে ভুগেছিল অনেক। কিন্তু মাকে শেষ দেখা দেখতে পারেনি ওরা। মেজবাহর ফেরার কোনো উপায় ছিল না। ফিরলে আর যেতে পারত না। কাগজ না থাকার বেদনা টের পেয়েছিল মেজবাহ তখন। ধিক্কার দিয়েছিল নিজের দুর্গতির জন্য।

সেই ফেরা এখন ফিরতে হচ্ছে কিন্তু মা তো নেই। মা-বাবাকে আর দেখবে না কখনো।

ষোলো বছরের স্মৃতি তো কম না। মেজবাহর বয়স এখন পঁয়ত্রিশের মতো। উনিশ বছর বয়সের সময় আমেরিকা এসেছিল। সালাহউদ্দিন ভাই অনেক চেষ্টা তদবির করে মেজবাহকে এনেছিল। মজনু কখনো বিদেশে আসতে চায়নি। অথচ হঠাৎ করেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় একদিন। সে বরাবরই উদাসীন প্রকৃতির। কারও কোনো খবর নিত না। কোনো দায়িত্ববোধ ছিল না। স্বার্থপর আর

আত্মকেন্দ্রিক ছিল। মেজবাহর চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড় ছিল। তবে যা একটু মেজবাহর সাথেই সখ্য ছিল মজনুর। পিঠাপিঠি ভাই এমনই হয়।

মেজবাহ আমেরিকা চলে আসায় মজনু একটু কষ্ট পেয়েছিল। ছোট ভাইটাকে ভালোবাসত খুব। ও চলে যাওয়ায় আরও বোহেমেয়িান হয়ে যায় মজনু। উদাসীন। কোনো কিছুতে মন নেই। রাতের পর রাত ঘরে ফেরে না। কই থাকে কেউ জানেও না। বস্তুত মজনু একলা হয়ে পড়েছিল। বোন তেমন কিছু করতে পারত না। ওর খাওয়াদাওয়াই সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। তারপর একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

অনেক পরে জানা গেল সে সাউথ আফ্রিকায় গেছে। জোহানেসবার্গে। কাউকে কিছু বলেও যায়নি। কেমন আছে, কী করছে কিছু জানা যায় না। মেজবাহর সাথে কালেভদ্রে যোগাযোগ হতো। সালাহউদ্দিন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করত না। তার প্রতি অনেক অভিমান আছে। কেন তা মেজবাহ জানে না। হয়তো বা ওকে আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। মজুন কখনো বিদেশ যেতেও চাইত না।

মেজবাহ পড়াশুনাটা করতে পারেনি। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বরিশাল বিএম কলেজে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল মাত্র। ইকোনমিকসে মাত্র ক্লাস করা শুরু করেছিল তারপর হুট করে চলে গেল আমেরিকা। ভুল সাবজেক্ট চুজ করেছিল মেজবাহ। তখন বুঝত না অনার্স কী জিনিস। বন্ধুদের দেখাদেখি ভর্তি হয়ে গেল। এমনই কাঠখোট্টা সাবজেক্ট যে মেজবাহ একদম এনজয় করত না।

ক্লাসে যেত আড্ডা দিতে। বেশ কয়েকটি মেয়ে পড়ত ওর সাথে। তার মধ্যে একটা মেয়ের সাথে বেশ খাতির ছিল মেজবাহর। মেয়েটা ওকে খুব পছন্দ করত। মেয়েটির নাম নিনা। সম্ভবত ওকে চাইত খুব। মেজবাহও ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বন্ধুরাও জানত ওদের কিছু একটা হবে। কিন্তু মেজবাহ আমেরিকা চলে আসায় সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সবকিছুই দ্রুত ঘটেছিল। তিন-চার মাসের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছিল মেজবাহর জীবনে।

মেজবাহ দেখতে সুদর্শন ছিল। সহজেই মেয়েরা ওর বন্ধু হয়ে যেত। মেজবাহ এখনও দেখতে সুদর্শন। লম্বার মধ্যে স্বাস্থ্যটাও মন্দ না। সবসময়ই ও এমন ছিল। নিজের প্রতি যত্নবান ছিল। আমেরিকায় নিয়মিত জিম করত। কাজের পর রাতের দিকে জিমে যেত। ঘরেও ফ্রি হ্যান্ড কিছু করত। কিন্তু মজার ব্যাপার কোনো মেয়ের প্রতি সিরিয়াস না মেজবাহ।

অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে কিন্তু প্রেম বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। কারও প্রতিই মেজবাহ সেভাবে আকৃষ্ট হয়নি। কখনো বিয়ের কথাও ভবেনি। কোনো মেয়েও ওকে বলেনি আসো সংসার করি। আমেরিকায় কখনো যে বিয়ের কথা ভাবেনি তা না। যদি কেউ বিয়ে করত যার কাগজ আছে তাহলে আজকে ওকে ফিরে আসতে হতো না। এই উদাসীনতাই ওর কাল হলো।

মেজবাহর কোনো খারাপ রেকর্ড নেই। তা সত্ত্বেও ওকে চলে আসতে হলো। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির লোকজন একদিন ওর ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল। মেজবাহ চলে না এলে হয়তো জেলে যেতে হতো। ওর মতো হাজার হাজার ইলিগ্যাল লোক আছে আমেরিকায় কিন্তু ওরই ভাগ্য খারাপ। একদিন বাধ্য হলো প্লেনে চড়তে।

মেজবাহর চলে আসতে খারাপ লেগেছে এটা সত্য। কী করবে দেশে! এত বছরের গ্যাপ! কিছুই চেনে না, জানে না। আত্মীয়স্বজনের সাথেও তেমন যোগাযোগ নেই। তাছাড়া ও একেবারে চলে এসেছে এটা জানাজানি হলে কেউ ওকে পাত্তা দেবে না। ওর প্রতি আগ্রহ দেখাবে না। আত্মীয়স্বজনরা আরও না। স্কুল-কলেজের কিছু পুরনো বন্ধুরা আছে। ওদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই অনেকদিন। শুধু মনিরের সাথে যোগাযোগ আছে। কে কোথায় আছে কেউ জানে না। মেজবাহ খুব বেশি সামাজিক না। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও বেশি অ্যাক্টিভ ছিল না।

আসার সময় সর্বসাকুল্যে হাজার পনেরো ডলার সাথে নিয়ে আসতে পেরেছে। এটা দিয়ে কতদিন চলবে কে জানে! কিছু একটা শুরু করতে হবে। কোথায় থাকবে তাও এখনও ঠিক করেনি। মনির এবং আরও দু-একজন বন্ধু অফার দিয়ে রেখেছে। বাড়িতে কেউ নেই। মা মারা যাওয়ার পর বাড়িতে ওদের দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয় দেখাশুনা করছে এটাই জানে। খুবই ভালো মানুষ। সামান্য কিছু সম্পত্তি বাবা রেখে গেছেন। মজনুর কোনো খবর নেই। এখন বাড়িঘরের দেখাশুনার দায়িত্ব মেজবাহর ওপর চাপবে। খলিল চাচা আর কতদিন দেখবেন। বয়স হয়েছে ওনার।

মেজবাহর বিষয়-সম্পত্তির প্রতি তেমন আগ্রহ নেই। কগজপত্র কোথায় কীভাবে আছে কে জানে। সম্ভবত খলিল চাচার কাছেই সব। ওরা তিন ভাই ছাড়াও বড় বোনও কিছু সম্পত্তি পাবে। শুনেছে জমিজমা বর্গা থেকে কিছু টাকা আসে। সামান্য টাকা। অঙ্কটা জানে না। খলিল চাচা জানে। টাকাটা ব্যাংকে জমা করা হয় নাকি। কত জমেছে জানে না। অঙ্কটা বড় হওয়ার কথা না।

চলে আসার আগে ভালোমতো প্রস্তুতি নিতে পারেনি মেজবাহ। হুট করেই চলে আসতে হলো। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আর দেরি করেনি। সালাহউদ্দিন ভাই এসেছিলেন নিউইয়র্ক। তিনিই এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেন। মেজবাহ খুব কেঁদেছিল চলে আসার সময় ভাইকে জড়িয়ে ধরে। কেন কান্না পেয়েছিল কে জানে! হয়তো এক অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে। এত বছর পর অ্যাডজাস্ট করতে পারবে কি না এটা ভেবে দুশ্চিন্তা কাজ করেছিল।

চিন্তা করিস না। চলে যাওয়াই ভালো। আবার অ্যাপ্লাই করার সুযোগ থাকবে। ডিপোর্ট করলে আর সেই সুযোগ থাকত না। নিয়ম মেনে চলে যাওয়া ভালো।

মেজবাহ চুপ করে থাকে। কথা বলে না। চোখ ভিজে ওঠে।

মন খারাপ করিস না। তোকে আবার নিয়ে আসব। দেশে গিয়ে সাবধানে থাকবি। দেশ আর আগের মতো নাই রে। যার তার সাথে মিশবি না।

কোথায় থাকব গিয়ে সেটা ভাবছি!

বাড়িতে থাকবি আবার কোথায়। খলিল চাচা সব ব্যবস্থা করে রাখবে। আর ঢাকায় যদি কিছু একটা করতে পারিস তাহলে ঢাকায় থাকবি।

আমাকে কে চাকরি দেবে! পড়াশুনাটাও তো শেষ করতে পারিনি।

সেটা দেখা যাবে। এখনই এত চিন্তার দরকার নেই। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। দেশে মানুষ অনেক কিছু করছে। তোর তো আইটি জ্ঞান ভালো। ই-কমার্স বিজনেস করবি। ইংরেজি ভালো জানিস।

হ্যাঁ তা ঠিক বলেছেন। বিজনেস কিছু করার চিন্তা করব।

চাকরির চেষ্টা করে দেখতে পারিস। অনেক অফিসে আইটি লোক হায়ার করে এখন। বেতনও ভালো দেয়।

আমিও তাই শুনেছি।

এখনই ঘাবড়ে যাবার মতো কিছু হয় নাই। দেশে এখন অনেক কাজের সুযোগ আছে। মাথা খাটিয়ে কিছু বের করে ফেলবি। কত মানুষ ফিরে যাচ্ছে। আসা যাওয়া করছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আচ্ছা।

সাবধানে থাকবি।

আপনি ভালো থাইকেন ভাইজান।

আমার জন্য ভাবিস না।

প্রথম কয়েকদিন ঢাকায় মনিরের কাছে থাকব। ওর সাথে কথা হয়েছে।

যেটা ভালো লাগে তোর।

ও এখন সাকসেসফুল বিজনেসম্যান। বড় বাড়ি ঢাকায়।

ভালো তো। খুব ভালো। তবে বেশি কারও ওপর ডিপেনডেন্ট হবি না।

ঠিক আছে।

সালাহউদ্দিন ভাই বিদায় নেন। আজই ভার্জিনিয়া ফিরে যাবেন।

২

আমেরিকাকে অনেক মিস করবে মেজবাহ। ততটা সামাজিক না হলেও অনেক বন্ধু হয়েছিল নিউইয়র্কে। এই শহর কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। কাউকে একলাও করে দেয় না। ছোটবেলায় মেজবাহ খুব বইয়ের পোকা ছিল। লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ত। বন্ধুদের কাছ থেকে বই বোরো করত। ভ্রমণকাহিনি ওর খুব প্রিয়

ছিল। এখনও সুযোগ পেলে বই পড়ে। তবে সময় পায় না বেশি। ভ্রমণকাহিনি পড়েই ওর বিদেশের প্রতি আগ্রহ জন্মে। বিশেষ করে আমেরিকার প্রতি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' আর শঙ্করের 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বই দুটো পড়েছিল। দুটোই আমেরিকার ওপর ভ্রমণকাহিনি। এসব বই পড়েই মনে হয়েছিল একদিন আমেরিকা যাবে। সালাহউদ্দিন ভাইকে বলেছিল আমি আমেরিকা যেতে চাই।

জেএফকে-তে এসে অদ্ভুত একটা ফিলিংস হলো মেজবাহর। আমেরিকা আসার পর অন্য কোনো দেশে যেতে পারেনি। যাওয়া সম্ভবও ছিল না। মনে আশা ছিল একদিন কাগজ হলে সবার আগে নিজের দেশে যাবে। আমেরিকার কয়েক জায়গায় গিয়েছে শুধু। প্রথম আমেরিকা ঢুকেছিল এই এয়ারপোর্ট দিয়েই। দুবাই হয়ে এসেছিল এমিরেটসে। দুবাইতে মিলিনিয়াম হোটেলে বিশ ঘণ্টার স্টপওভার ছিল। সেই সুযোগে রাতের দুবাইটা ঘণ্টাখানেক ঘুরে দেখেছিল। একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। ড্রাইভার এক ঘণ্টার জন্য বিশ ডলার নিয়েছিল। আবার একই এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে যাচ্ছে নিজ দেশে। আর কি কখনো ফেরা হবে স্বপ্নের আমেরিকায়! ওটা ভেবে মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে।

কত স্মৃতি আমেরিকায়। তরুণ বয়সের কত ফ্যান্টাসি থাকে। প্রথম তিন-চার বছর ভার্জিনিয়াতে তেমন ভালো লাগেনি। নিউইয়র্ক এসে সত্যিকার আমেরিকার মজা উপভোগ করতে শুরু করেছিল। নিউইয়র্ক কখনো দেশকে মিস করতে দেয়নি। কত রকমের মানুষ প্রতিদিন এই শহরের বুকে পা রাখছে। যাদের দেশে কোনোদিন দেখতে পেত না তাদের দেখতে পাচ্ছে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি সবাইকেই একবার নিউইয়র্কে পা রাখতে হয়। বিশেষ করে বাঙালি অধ্যুসিত জ্যাকসন হাইটসে। সারাক্ষণ রাজা উজির মারছে লোকজন এখানে বসে।

সালাহউদ্দিন ভাই নিতে এসেছিলেন জেএফকে-তে মনে আছে। মেজবাহ ভয় ভয় নিয়ে ইমিগ্রেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। এর আগে মেজবাহ কোনোদিন বিদেশে যায়নি। আমেরিকাই প্রথম বিদেশ। অবাক কাণ্ডই বটে। ইয়া জায়ান্ট একজন ধবধবে সাদা অফিসার দু-চারটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল এনজয় আমেরিকা। তারপর নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমে অন্যরকম অনুভূতি হয়েছিল। বাপরে কত গাড়ি, কত বড় রাস্তা, হাইওয়ে। আমেরিকা সম্পর্কে অনেক শুনেছে কিন্তু কখনো যে আসতে পারবে বোঝেনি মেজবাহ। সবসময় স্বপ্ন দেখত একদিন আমেরিকা যাবে। বড় ভাই চলে যাওয়ার পর থেকেই ওর মনেও ঢুকে গিয়েছিল আমেরিকা।

ভাইজান ডিভি পেয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়।

পুরো যাত্রপথেই মন খারাপ থাকে মেজবাহর। দুবাইয়ে পাঁচ ঘণ্টার মতো

লেওভার ছিল। ঝিম মেরে বসে থেকেছিল পুরো সময়। অনেক বাঙালি কাজ করছে এয়ারপোর্টে দেখল মেজবাহ। তাদের কথা শুনল কিন্তু কারও সাথে যেচে কথা বলতে ইচ্ছে করল না। যেবার আমেরিকা গিয়েছিল সেবার দু-একজনের সাথে কথা হয়েছিল মনে আছে। ওরা খুব গুরুত্ব দিয়েছিল মেজবাহকে। আমেরিকা বিরাট ব্যাপার ওদের কাছে। ওদেরও স্বপ্ন আমেরিকা। কিন্তু সবার ভাগ্যে কি সব হয়!

মেজবাহ ভাগ্যবান। এই পথ দিয়েই গিয়েছিল একদিন। আজ কিছুই ভালো লাগছিল না মেজবাহর। প্লেনের খাবারও বিষাদ লেগেছিল। কয়েকবার কেঁদেছেও। কোনো মানে নেই যদিও। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছুই আনতে পারেনি। ১০০ পাউন্ডে যতটুকু আনা সম্ভব তাই এনেছে। নিজের কাপড়চোপড়ই বেশি। কারও জন্য কিছু আনা সম্ভব হয়নি। কার জন্য আনবে! বড় বোন অসুস্থ! ভাগনির মেয়েদের জন্য চকোলেট এনেছে। মনিরের ওখানে উঠবে আপাতত তাই মনিরের বাচ্চার জন্য এবং ওর বউ নিলার জন্য গিফট কিনেছে।

অনেক কিছুই ফেলে আসতে হয়েছে। ফেলে দিতে হয়েছে। ওদেশে কাকেই বা দেবে। কিছু দরকারি জিনিস, ঘরের জিনিস বন্ধুদের দিয়ে এসেছে। মেজবাহর নেইবার ছিল বাঙালি পরিবার। তাদেরও কিছু জিনিস দিয়ে এসেছে। হাঁড়ি-পাতিল, ওভেন, ফ্রিজ এসব বিক্রি করেনি। মেজবাহ বেশ শৌখিন ছিল। দামি টিভি কিনেছিল। ফোরকে টিভি। সনি ব্রাভিয়া। সাউন্ডবার কিনেছিল স্যামসংয়ের। কিছু বইপত্র ছিল। বেশিরভাগই কবিতার বই। হারমোনিয়াম, গিটার এসবও ছিল। জরুরি কিছুই আনতে পারেনি। অনেক পছন্দের কাপড় আনা সম্ভব হয়নি। দামি দামি স্যুট, জ্যাকেট, শার্ট, কম্বল বিছানা সব রেখে আসতে হয়েছে। অনেক কিছুই গিফট করে দিয়ে এসেছে। একটা মানুষের কত কিছু লাগে। একজন থাকা আর পাঁচজন থাকা একই। আস্তে আস্তে জমে ওঠে সংসারের জিনিস। জমতে জমতে স্তূপ হয়। তারপর একদিন সব ফেলে আসতে হয়। এটাই বাস্তবতা। এসব ভেবে মেজবাহর মন হালকা হয়।

ফিরে আসাটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এক পর্যায়ে। বলতে গেলে নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা।

তবে মনে আশা আছে আবার হয়তো যেতে পারবে। আমেরিকাকে সত্যি ভালো বেসেছিল মেজবাহ। তরুণ বয়সে এসেছে। একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্য দিয়ে ষোলো বছর চলে গেছে। আমেরিকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না। সবসময় মনে করত আমেরিকা আমার। এখন পর হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে রাতের দিকে জ্যাকসন হাইটসে শাকিল ভাইয়ের গ্রাফিকস ওয়ার্ল্ডে বসত মেজবাহ। শাকিল ভাই মানুষটা নাইস। এত ব্যস্ত মানুষ তবুও যেই যেত হাসমুখে কথা বলত সবার সাথে। চা খাওয়াত। লেখক সাংবাদিকদের আড্ডা ওখানেই বেশি হয়। আড্ডায় প্রায়ই আসতেন লেখক সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন, কখনো মশিউর, কখনো নিহার সিদ্দিকী, মুন্না ভাই, দর্পণ কবির।

আরও কতজন আসত। এই শহরে লেখক কবির অভাব নেই। শত শত সাংবাদিক, কয়েক ডজন পত্রিকা। প্রেসক্লাব আছে কয়েকটা। মেজবাহ যদিও এসবের সাথে জড়িত না কিন্তু ওর ভালো লাগে। নিউইয়র্ক যেন পুরো পৃথিবী। এজন্যই নিউইয়র্ককে পৃথিবীর রাজধানী বলা হয়। কেন বলা হয় মেজবাহ টের পায়।

কিরন মানুষটা মেজবাহর অনেক পছন্দ ছিল। স্টাইলিস্ট এবং সুদর্শন। বহু বছর থাকেন নিউইয়র্কে। একলার জীবন, একলা রাঁধেন, একলা খান, একলা বাঁচেন। মেজবাহর মতোই। কিরন মেজবাহর চেয়ে বয়সে অনেক বড় কিন্তু বন্ধুত্ব হতে আটকায়নি। কোনো একটা অদ্ভুত কারণে কিরন মেজবাহকে বেশ পছন্দ করে। চলে আসার দুই দিন আগে কিরন ভাই মেজবাহকে ইত্যাদি রেস্টুরেন্ট ইনভাইট করেছিল। ডিনার খাইয়েছিল। কিরন ভাই সবাইকেই আপ্যায়ন করেন। দেশ থেকে লেখক সাংবাদিক যারাই আসেন তারা একবার কিরনের আতিথেয়তা পান।

অনেক গল্প করেছিল ওরা দুজন। কিরন একটু আবেগাক্রান্ত হয়েছিল। মেজবাহ নিজেও। আর কি দেখা হবে কখনো! মেজবাহ আবার ফিরতে পারবে কি না কে জানে! সবকিছুই অনিশ্চিত। ভাগ্য মেজবাহকে সহায়তা করেনি। না হলে ওকেই কেন ফিরে যেতে হবে! এমন তো নাও হতে পারত। এক অনিশ্চিত জীবন শুরু হতে যাচ্ছে আবার। সবকিছুই গুছিয়ে নিয়েছিল মেজবাহ। যে কাজটা করত সেটা ভালো ছিল। কাজটা এনজয় করত। সহকর্মীরাও খুব ভালো ছিল।

অনেক বছর ধরেই কাজটা করে আসছিল। ম্যানেজার ওকে পছন্দ করত। মেজবাহ সিনসিয়ার ও অনেস্ট। কোনো খারাপ রেকর্ড নেই। তা সত্ত্বেও ভাগ্য মন্দ হলে যা হয়। সালাহউদ্দিন ভাই খুবই আপসেট হয়েছেন ছোট ভাইটার জন্য। এই ভাইটার প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা। ভার্জিনিয়া থেকে যেদিন চলে এসেছিল সেদিন খুব কেঁদেছিল সালাহউদ্দিন। কেউ টের পায়নি।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের স্ত্রী কখনো এই পরিবারটির প্রতি সদয় ছিল না। মেজবাহকেও গ্রহণ করতে পারেনি মন থেকে। সবসময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে। সালাহউদ্দিন ভাইয়ের প্রতিও কোনো সম্মান নেই। তাকেও মানুষ বলে মনে করে না। নিজের ভাই মা সবাইকে নিয়ে এসেছে। নিজের কাছেই রেখেছে দিনের পর দিন। কিন্তু মেজবাহকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলতে গেলে।

কাজের জায়গায় সবাই খুব আপসেট হয়েছিল মেজবাহর চলে যেতে হবে শুনে। ছোটখাটো একটা ফেয়ারওয়েল হয়েছিল। সবাই অনেক ভালো ভালো কথা বলেছে মেজবাহ সম্পর্কে। মেজবাহকে এই কাজটা পাইয়ে দিয়েছিল কিরনই। সে নিজেই একসময় এখানকার ম্যানেজার ছিল। এজন্য মেজবাহ সবসময় কিরনের প্রতি কৃতজ্ঞ। কখনো ভুলবে না।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের সাথেও কিরনের দারুণ সখ্য। মূলত সালাহউদ্দিন ভাইয়ের মাধ্যমেই মেজবাহর সাথে পরিচয়। কিরন ও সালাহউদ্দিন কাছাকাছি বয়স। মেজবাহ কিরনের চেয়ে ছোট হলেও কিরন এমন একজন মানুষ যে সবাইকে আপন করে নিতে পারে তার মধুর ব্যবহার দিয়ে।

সালাহউদ্দিন ভাই শুরুর কয়েক বছর নিউইয়র্কেই ছিল। পরে ভার্জিনিয়া চলে যায়। ওখানে একটা ভালো চাকরি পায়। তারপর আর নিউইয়র্ক ফেরা হয়নি।

কয়েকজন মেয়ের সাথেও বন্ধুত্ব হয়েছিল মেজবাহর। এরা বেশিরভাগই ছিল লেখালেখির জগতের। এর বাইরে কয়েকজনের সাথে সম্পর্ক ছিল। একজন খুব ভালো বন্ধু ছিল। ওরা একসাথে মাঝে মাঝে ঘুরত, রেস্টুরেন্টে খেত। ওর নাম ছিল ইভা। খুবই সুন্দর দেখতে। ইভাও মেজবাহকে পছন্দ করত। হয়তো কিছুটা ভালোবাসাও হয়েছিল। ইভা ম্যারেড ছিল। তবে হ্যাপি ছিল না। বিয়েটা ভেঙে যায় যায় অবস্থা। মেজবাহকে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছিল। ইভা ভালো মেয়ে। মনটা আইসক্রিমের মতো মোলায়েম। সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে। বেশ লম্বার মধ্যে সুন্দর সুগঠিত দেহবল্লরি ইভার। যে কেউ ক্রাশ খাবে। একটা কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠানে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে জ্যামাইকা পারফরমিং আর্ট সেন্টারের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প করেছিল।

ইভা ছাড়াও পলি, রিমি, রওশন, শেমু, আইরিন, লুসি ওরাও খুব ভালো বন্ধু ছিল। মেজবাহ কবিতা আবৃত্তি করত, গান গাইত বলেই ওরা গুরুত্ব দিত, না হলে মেজবাহকে কে আর চিনবে। মেজবাহ বেশি কোথাও যেত না যদিও, সময় পেত না, সাত দিন কাজ করলে কি আর সময় পাওয়া যায়! তাও সন্ধ্যার দিকে বেরিয়ে পড়ত। উডসাইড থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসত জ্যাকসন হাইটসে।

নিউইয়র্ক এত চমৎকার শহর। সব জায়গায় ট্রেনে যাওয়া যায়। কখনো কখনো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াত। ম্যানহাটন যেত। বিশাল বিশাল বিল্ডিং, টাইম স্কয়ারে এলে মন ভালো হতে বাধ্য। মজার মজার খাবার খেত। ওর আরও কয়েকজন বন্ধু ছিল। ওদের সাথে গাড়িতে ঘুরত। ষোলো বছরের অনেক স্মৃতি। কত মানুষের সাথে পরিচয়, সখ্য, গল্প হয়েছে। আর কি কখনো তাদের সাথে দেখা হবে! এসব ভেবে মেজবাহ একটু আনমনা হয়।

কখন একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ টের পেল প্লেন ঢাকার মাটিতে ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাইলট ঘোষণা করে যাচ্ছেন। লোকজন নেমে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে দুবাই থেকে যারা উঠেছে তাদের তর সইছে না নেমে পড়ার জন্য। কেবিনক্রুরা বারবার অনুরোধ করছে প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সিটবেল্ট পরে থাকতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে ওভারহেড লকার থেকে ব্যাগ বের করতে লেগেছে।

মেজবাহ আস্তে ধীরে প্লেন থেকে নেমে এলো। যেন ওর কোনো তাড়া নেই। কারও অপেক্ষা নেই তেমন। কাউকে তেমন বলেওনি। ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে এটা কি বলা যায়! ষোলো বছরের গ্যাপ। কম কথা না। কেউ ওকে চিনবে না আর তেমন। শুনেছে ঢাকা শহর অনেক বদলে গেছে। মানুষজনও বদলেছে। কিছুই আগের মতো নেই। বিষণ্নতার মধ্যেও দুবাইতে একজনের সাথে একটু পরিচয় হয়। একটা মেয়ে। একলাই এসেছে। ফ্লাইটে পেছনের দিকে হয়তো কোথাও বসেছিল। এদিক ওদিক তাকাল মেজবাহ। দেখতে পাচ্ছে না মেয়েটিকে।

মেয়েটি এসেছে মেলবোর্ন থেকে। ওর নাম লিমি। দুবাইতে ট্রানজিট ছিল। মেজবাহর ছিল পাঁচ ঘণ্টা আর ওই মেয়েটির ছিল তেরো ঘণ্টা প্রায়। মেলবোর্নে ভাইয়ের সাথে থাকে। ম্যারেড কি না জানা হয়নি। কেউই এ নিয়ে কথা বলেনি। দেখতে খুব সুন্দর। ফ্লাইট কোন গেটে এটা খুঁজতে গিয়েই কথা হলো দুজনার। মেজবাহ আমেরিকা থেকে এসেছে শুনে মেয়েটি আগ্রহ নিয়ে কথা বলল। মেজবাহই জিজ্ঞেস করেছিল, বাংলাদেশি কি না। খুব বেশি কথা হয়নি যদিও। তবে মেজবাহকে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়েছে।

৩

ইমিগ্রেশন পার হয়ে এলো লাগেজের জন্য। লম্বা লাইন। এখানেও লিমিকে খুঁজল কিন্তু দেখছে না তো! গেল কোথায়! আজব কাণ্ড তো। অন্তত লাগেজের জন্য এখানে তো আসার কথা। হয়তো এখনও ইমিগ্রেশন ক্রস করতে পারেনি। যাই হোক ফোন নম্বর তো আছে। কখনো যোগাযোগ করা যাবে।

ইমিগ্রেশনের অফিসারগুলো নানা প্রশ্ন করছিল। এতদিন পর কেন এসেছে! পাসপোর্ট হয়নি কেন! ডিপোর্ট করেছে কি না। গোমরামুখো অফিসারটা একটু কি সন্দেহ করছিল মেজবাহকে। মেজবাহ একটু টেনশন ফিল করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢাকার একটা অ্যাড্রেস এবং ফোন নম্বর রেখে ছেড়ে দিল মেজবাহকে। আপাতত মনিরের ফোন নম্বর দিয়েছে ইমেগ্রশনকে। একটা কনটাক্ট নম্বর দিতে হয় নাকি। জাস্ট ফরমালিটি।

মেজবাহ এসব কিছুই জানে না। সে জীবনে একমাত্র বিদেশ বলতে আমেরিকায়ই গিয়েছে। এত বছর পর আবার ফিরে এসেছে। মাঝখানের ষোলো বছর দুই-তিনবার প্লেনে উঠেছে। একবার গিয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেসে। একবার ফ্লোরিডায়। আর একবার সম্ভবত ডালাসে।

মনির মেজবাহর অনেক পুরনো বন্ধু। ওর সাথেই যা একটু যোগাযোগ ছিল। আর যোগাযোগ ছিল নিনার সাথে। মেজবাহ যে দেশে আসছে সেটা নিনাকে